ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

হাঁটা সবচেয়ে উত্তম ব্যায়াম

আমাদের মতো দেশে সাধারণত রোগ একটা না বাঁধালে কেউ পারতপক্ষে হাঁটতে যায় না। পার্ক বা ময়দানে নিয়মিত যারা হাঁটতে যায়, তাদের অধিকাংশই এরই মধ্যে কোনো না কোনো রোগ-বিমারিতে আক্রান্ত হয়ে গেছে বা রোগের পূর্বাভাস পেয়ে হাঁটা শুরু করেছে। ওষুধের ব্যবহার বা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়া শরীরের সুগার লেভেল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যায়াম বা হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসারে রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ অনেক শ্রেয়। রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার আগ থেকেই যদি নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা হয়, তাহলে বহু রোগ থেকেই মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, শরীরের প্রতি অনিয়ম ও অত্যাচারের কারণে সবার অজান্তে রোগ দেহে বাসা বাঁধে। রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার পরও অনেকে রোগের কথা টের পায় না। আর যখন বুঝতে পারে, তখন আর সময় থাকে না। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায়। এ অবস্থায় রোগ নিয়ন্ত্রণ জটিল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস এমনি একটি জটিল ও মারাত্মক রোগ।

প্রচলিত অর্থে সুগার বলতে চিনিকে বোঝালেও ডায়াবেটিসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বস্তুটির নাম হল গ্লুকোজ। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সুগার বলতে গ্লুকোজকেই বোঝানো হয়। অন্যদিকে, চিনি বা সুক্রোজ হল গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজের সমন্বয়ে গঠিত একটি ডাইস্যাকারাইড। খাওয়ার পর কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাবার অন্ত্রে এনজাইমের উপস্থিতিতে ভেঙে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয় এবং বিশোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। গ্লুকোজ হল শরীরের মূল শক্তির উৎস, যাকে দেহের জ্বালানি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ইনসুলিন হল এক ধরনের হরমোন যা পেনক্রিয়াস থেকে উৎপন্ন হয় এবং রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শরীরে ইনসুলিনের অভাব হলে রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে বিঘ্ন ঘটে এবং ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টির কারণ ঘটে। মানবদেহ নিজ ক্ষমতা বলে রক্তে গ্লুকোজ এবং সেল বা কোষকর্তৃক গ্লুকোজ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনমতো ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারে। ইনসুলিনের কাজ হল, রক্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্লুকোজ রেখে বাড়তি সব গ্লুকোজকে গ্লাইকোজেনে রূপান্তরের মাধ্যমে লিভার ও বিভিন্ন মাংসপেশিতে মজুদ রাখা। না খাওয়ার কারণে, উপোস করলে বা বেশি পরিশ্রমের ফলে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে গ্লাইকোজেন আবার গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে রক্তে জমা হয় এবং পরে সেলে প্রবেশ করে। ইনসুলিন এ রূপান্তরের মাধ্যমে গ্লুকোজকে শরীরের সেল বা কোষে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। ইনসুলিনের অভাবে শরীরের কোষ সুষ্ঠুভাবে গ্লুকোজের সদ্ব্যবহার করতে পারে না। তাই অতিরিক্ত গ্লুকোজ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। তবে সুগার মেটাবলিজম এবং ইনসুলিনের কার্যপ্রণালী যেভাবে বর্ণনা করা হল তার চেয়ে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল।

সুস্বাস্থ্যের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রাম, সুষম খাবার এবং নিয়মিত ব্যায়াম অপরিহার্য। নিয়মিত ব্যায়ামের মাধ্যমে ডায়াবেটিস, বিভিন্ন হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের মতো জটিল ও মারাত্মক রোগের প্রতিরোধ সহজ হয়। আগেভাগে নিয়মিতভাবে পর্যাপ্ত ব্যায়াম করলে ডায়াবেটিসের আশংকা অনেক হ্রাস পায়। তাই রোগী হিসেবে নয়, একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস করা বাঞ্ছনীয়।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, রমনা পার্ক, সংসদ ভবন চত্বর বা অন্যান্য খোলামেলা জায়গায় গেলে দেখা যায়, বহু মানুষ সকাল-বিকাল হাঁটছেন। কেউ জোরে, কেউ বা ধীরে, কেউ একা আবার কেউ দলবেঁধে । জোয়ান, মাঝ বয়সী, বৃদ্ধ— সবাই হাঁটছে। মা-বোনেরাও পেছনে পড়ে নেই। হাঁটার জন্য খুব বেশিকিছুর দরকার হয় না। একজোড়া ভালো জুতা, আরামদায়ক পোশাক আর একটি হাসিখুশি মন। উল্লসিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মন না থাকলে হাঁটা গতানুগতিক ও মনোটোনাস হয়ে পড়বে, আনন্দঘন হবে না। খুব ভোরে উঠে, অফিস-আদালত সেরে বা ঘরকন্না শেষ করে হাঁটতে বেরোনোর জন্য প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকতে হয়। তবে হাঁটতে শুরু করলে অল্পদিনের মধ্যে হাঁটা অভ্যাসে পরিণত হয়। পার্ক বা ময়দানে হাঁটার অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যপূর্ণ। এসব স্থানে হাঁটতে গেলে বিচিত্র রকমের লোকজনের সান্নিধ্যে আসা যায়, বিচিত্র রকম কথাবার্তা শোনা যায়, হাসি-ঠাট্টা রং-তামাশায় অংশ নেয়া যায়। কথাবার্তায় থাকে নতুনত্ব। এক্ষেত্রে নিয়মনীতির বালাই নেই। যে কোনো বিষয়ই আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, ফুটবল, ক্রিকেট, লেখাপড়া, শিল্প-সংস্কৃতি, পারিবারিক জীবন— কোনো কিছুই আলোচনা থেকে বাদ পড়ে না। অসুস্থতায় ভুগছেন যারা, তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ রোগের ওপর একেকজন সুপণ্ডিত। তাদের সঙ্গে হাঁটলে প্রচুর শেখার অবকাশ থাকে। যারা হাঁটেন, তাদের কেউ সরকারি চাকুরে, কেউবা শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ উকিল, ব্যারিস্টার আর কেউ বা চিকিৎসক। মজার ব্যাপার— চিকিৎসকরাও রোগে ভোগেন, তারাও হাঁটেন। পেশা ও শ্রেণীগত দিক থেকে কোনো ইউনিফর্মিটি না থাকলেও মন-মানসিকতার দিক থেকে এখানে কোনো বৈষম্য নেই। এখানে সবাই একই পথের পথিক, সবাই বন্ধু। একদিনের নয়, প্রতিদিনের। একদিন কেউ হাঁটতে না এলে সবাই উৎসুক থাকেন তার না আসার কারণ জানার জন্য। সম্ভাব্য অসুখ-বিসুখ বা কোনো ধরনের অমঙ্গলের ভয়ে সবাই উদ্বিগ্ন থাকে। হাঁটায় শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ব্যায়ামও হয়। উন্মুক্ত প্রকৃতিতে হাঁটার বড় উপকার মানসিক প্রশান্তি বা মানসিক চাপ থেকে অবমুক্তি। সারাদিন অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য বা কঠোর পরিশ্রমের পর প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তার কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এ মানসিক চাপ এবং বিষণ্ণতা থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে অনেকেই ট্রাংকুলাইজার বা সিডেটিভ জাতীয় ওষুধ সেবন করে থাকে। এটি নিঃসন্দেহে একটি বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর প্র্যাকটিস। প্রকৃত অর্থে ওষুধ দিয়ে বিষণ্ণতা বা মানসিক অশান্তি থেকে অবমুক্তি সম্ভব নয়। হাসিঠাট্টা, আনন্দঘন খোলামেলা কথাবার্তা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে কিছুক্ষণ হাঁটলে মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে কিছুটা হলেও অবমুক্তি সম্ভব। খোলামন নিয়ে ব্যায়াম বা হাঁটার মাধ্যমে মানসিক চাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারটি যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হাঁটার বহুবিধ উপকার রয়েছে। নিয়মিত হাঁটলে দেহমন সচল থাকে, দেহের সেলুলার কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির ফলে সেলে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, রক্তে লিপিডের পরিমাণ হ্রাস পায়, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, খাওয়ার রুচি বাড়ে, রাতে ভালো ঘুম হয়, পরিপাক ও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া উজ্জীবিত হয়। ব্যায়ামের ফলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম না করলে শরীরের সেলগুলো নির্জীব হয়ে পড়ে বলে কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়। তাই আর দেরি নয়। আসুন আজই হাঁটতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই।

তবে হাঁটার আগে ঠিক করা দরকার, হাঁটার গতি ও পরিমাণ কেমন হবে। শরীরের অবস্থা বুঝে গতি ও পরিমাণ ঠিক করা উচিত। হৃদরোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে বেশি জোরে বা অতি বেশিমাত্রায় হাঁটার ব্যাপারে বিধি-নিষেধ রয়েছে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের ইনসুলিন গ্রহণ করে বেশিক্ষণ ধরে দ্রুতগতিতে হাঁটায় বিপদ হতে পারে। এক্ষেত্রে সুগার লেভেল মারাত্মক হ্রাস পাওয়ার কারণে হাইপোগ্লাইসেমিক শক্ হওয়ার মতো বিপদ ঘটতে পারে।

পার্ক বা ময়দানে হাঁটতে হাঁটতে ছোলা বুট বা বাদাম খাওয়ার আনন্দ অপরিসীম। হৃদরোগীদের জন্য বাদাম খাওয়া উপকারী। ওমেগা-৩ ফ্যাটসহ উত্তম খাদ্যগুণসম্পন্ন বলে মাঝে মাঝে বাদাম খাওয়া ভালো। এক পকেটে বাদাম, অন্য পকেটে খোসা, তারপর সুযোগ-সুবিধামতো বিনে ফেলে সাফ সুতরো। বাদাম খেতে বাধা নেই, তবে আবর্জনা ফেলে রাস্তা অপরিষ্কার করা চলবে না। কেউ কেউ আবার ঝালমুড়ি, আইসক্রিম, চকলেট, চুইংগাম খেতে ভালোবাসেন হাঁটতে হাঁটতে। তবে এসব খেতে গিয়ে ঢাকা শহরকে আরও আবর্জনাময় না করাই হোক আমাদের কালচার। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বাংলাদেশের রাস্তাঘাট, পথে-প্রান্তরে হাঁটতে হলে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হয়। যখন-তখন যত্রতত্র থুথু ফেলা ও প্রস্রাব-পায়খানা করা আমাদের জাতীয় বদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। হাঁটতে গেলে প্রায় আতংকে থাকতে হয়, কখন আবার কার থুথু গায়ে এসে পড়ে। থুথু ফেলা শুধু বদ অভ্যাস নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। হজমের জন্য থুথু অত্যন্ত মূল্যবান একটি জিনিস। থুথুতে রয়েছে এক ধরনের এনজাইম, যা খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে সাহায্য করে। থুথু শুধু অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করে না, থুথু রোগজীবাণুও ছড়ায়। পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতি যেখানে-সেখানে থুথু ফেলে না। যেখানে-সেখানে যখন-তখন থুথু না ফেলার অঙ্গীকার হোক আমাদের কালচারের অংশ।

এ প্রসঙ্গে জাপানের দু-একটি ঘটনার কথা বলি। আমরা যে হোস্টেলে থাকতাম তার পাশের বাড়িতে থাকতেন এক বৃদ্ধা। বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। তাকে প্রায় দেখতাম— বিকালে তার বাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করতে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে জাপানের কোনো জুড়ি নেই। তারপরও কদাচিৎ বাড়ির সামনের রাস্তায় কোথাও এক টুকরো কাগজ দেখলেও ভদ্রমহিলা তা হাতে তুলে নিয়ে বিনে ফেলার জন্য বাসায় নিয়ে যেতেন। দেখে আমি অবাক হতাম। বাড়ি তার। বাড়ির সামনের রাস্তা তার নয়। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। দেশ তো তার। আর একবার আমরা সি প্যারাডাইস দেখার জন্য ইওকোহামা যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে। আমাদের কম্পার্টমেন্টে একটি জাপানি পরিবারও ইওকোহামা যাচ্ছিলেন। আমাদের দেখে ভারতীয় মনে করে ভাব করতে এগিয়ে এলেন মা-বাবা ও তাদের একমাত্র মেয়ে। এ পরিবারটি বেশ কিছুদিন ভারতে ছিলেন। খোশ আলাপের মাঝখানে ভদ্রমহিলা আমাদের সবাইকে একটি করে চকলেট দিলেন। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী সেলিনা, দুই মেয়ে মিথি ও রীতি। আমরা সবাই চকলেট মুখে পুরে দিলাম কিন্তু চকলেটের মোড়কটি নিয়ে বিপদে পড়লাম। ট্রেনে ময়লা-আবর্জনা ফেলার কোনো বিন নেই। ভদ্রমহিলা তার পার্স খুলে আমাদের সামনে ধরে বললেন, এখানে ফেল। আমি বাড়িতে গিয়ে বিনে ফেলে দেব। অভিভূত হয়ে গেলাম। জাপানে কারও সর্দি-কাশি হলে মুখে মাস্ক না পরে বাড়ির বাইরে যায় না অন্যের অসুবিধা হবে বলে। এই হল জাপান। এই হল জাপানের মানুষ। ভাবি— আমরা কোথায় আছি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রতিদিন হাজার লোকের আনাগোনা। ঢাকার পার্ক ও উদ্যানগুলো আজকাল মাদকসেবী, ভাসমান পতিতা এবং গুণ্ডাপাণ্ডাদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুলিশের সামনে এসব জায়গায় মাদকসেবীরা মাদক গ্রহণ করে, প্রকাশ্যে ইনজেকশন নেয়। পুলিশ নির্বাক থাকে। সন্ধ্যার পর গুণ্ডা ও হাইজ্যাকারদের ভয়ে কেউ পার্ক বা উদ্যানে থাকতে সাহস করে না। ঢাকা শহরে পার্ক বা উদ্যানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। রাজধানীর লাখ লাখ লোকের জন্য গুটিকয়েক পার্ক বা উদ্যানের পরিবেশ সংরক্ষণ ও সেগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারের আরও তৎপর হওয়া উচিত। সরকারের জানা উচিত, এ সমস্যাগুলো নিয়ে জনসাধারণ প্রায়ই আলোচনা-সমালোচনা করে থাকে। আশা করি, কর্তৃপক্ষ ব্যাপারগুলো মূল্যায়নপূর্বক ত্বরিত ব্যবস্থা নেবে। তাহলে শত-সহস্র লোকের হাঁটার অভ্যাস আরও আনন্দময় ও অর্থবহ হয়ে উঠবে।

খোলামন নিয়ে ব্যায়াম বা হাঁটার মাধ্যমে মানসিক চাপ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারটি যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। হাঁটার বহুবিধ উপকার রয়েছে। নিয়মিত হাঁটলে দেহমন সচল থাকে, দেহের সেলুলার কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়, রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির ফলে সেলে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি পায়, রক্তে লিপিডের পরিমাণ হ্রাস পায়, রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে, খাওয়ার রুচি বাড়ে, রাতে ভালো ঘুম হয়, পরিপাক ও শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া উজ্জীবিত হয়। ব্যায়ামের ফলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম না করলে শরীরের সেলগুলো নির্জীব হয়ে পড়ে বলে কর্মক্ষমতাও হ্রাস পায়।

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : *প্রফেসর, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
drmuniruddin@gmail.com